Vol. 38 | No. 2 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

লোকসঙ্গীতের সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত

Volume	38
Issue	2
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী
Published online	February 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i2.6
Pages	93-127
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ২

Check for updates

লোকসঙ্গীতের সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিপুল সম্ভার বাঙালির অন্যতম মহৎ উত্তরাধিকার। গানের বাণীর পাশাপাশি বিচিত্র সুরের সমাহারে পূর্ণ রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই ভুবন। নব নব আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নিত্যনতুন সুরবিহারের প্রবণতা দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন জুড়ে।

শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের প্রভাব সর্বজনস্বীকৃত। পরে জমিদারীর কাজে দীর্ঘসময় পূর্ব বঙ্গে বসবাস এবং আরও পরে শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার সূত্রে বীরভূমে বাসকালে গ্রামীণ সুরের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর অনেক গানকে 'রবীন্দ্র-বাউলের গান' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গানে সুরারোপে বাউল, সারি, ভাটিয়ালী, কর্মসঙ্গীত প্রভৃতির সুর কি মাত্রায় ও রূপে বিচিত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ব্যবহৃত হয়েছে—তার উদঘাটন-প্রয়াস বর্তমান নিবন্ধের মূল অন্বিষ্ট।।

প্রভাষক, নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সঙ্গীতজগতের বিচিত্র রসের ধারায় অবগাহন করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানে নব নব পথের সন্ধান, নব নব মুক্তির আস্বাদন, নতুন আঙ্গিকের পরীক্ষা নিরীক্ষায় নিত্যনতুন সুরবিহার—এই প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়। মৌলিক রচনার পাশপাশি সুর নিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলা তাঁর সারাজীবন ধরেই চলেছে। কখনো রাগসঙ্গীত থেকে মূল সুর নিয়ে গান রচনা করেছেন, কখনো বা দেশীসঙ্গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্য সুরের মিলন ঘটিয়েছেন, আবার লোকসুরে গান বেঁধেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর গানের ঝরনাতলায় রাগসঙ্গীত, পাশ্চাত্যসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীত—এই ত্রিবেণী ধারার মিলন ঘটেছে দেখতে পাই। এই বিচিত্র সুর-সমন্বয়ের মাঝেও তাঁর গান বিশিষ্টতা লাভ করেছে মূলত কথা ও সুরের যুগল মিলনের পথ ধরে।

বাংলা সঙ্গীতের বিশেষত্ব যেমনটি কীর্তন-বাউলগানে দেখি, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তা আরো পরিমিত ও পরিশীলিত রূপে প্রকাশিত। আমরা জানি যে. বাংলা সঙ্গীত মাত্রেই দেশী-সঙ্গীতের আদর্শে পরিচালিত। এই দেশী-সঙ্গীতের আদর্শ পথে রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং লোকসঙ্গীতের মধ্যে যেমন যোগসূত্র লক্ষ করা যায়, তেমনি সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়ও আবার দেখা যায়। আলোচনার সুবিধার্থে এখানে বাউল, ভাটিয়ালী, সারি ও প্রাচীন সুরকে এককথায় লোকসঙ্গীত বা লোকসুর বলে অভিহিত করেছি।

রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীত বলতে দেশী-সঙ্গীতকে বুঝিয়েছেন। এই দেশী-সঙ্গীতের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীর সাংগীতিক ঐতিহ্য থেকেই। শৈশবে গ্রাম্যছড়া গান দিয়ে তাঁর সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়। কবি নিজেই *জীবনস্মৃতি*তে জানিয়েছেন :

> বিষ্ণুর কাছে দিশি গান শুরু হয়েছে শিশুকাল থেকে। .... বিষ্ণু যে গানে হাতেখড়ি দিলেন এখনকার কালের কোনো নামী বা বেনামী ওস্তাদ তাকে ছুঁতে ঘৃণা করবেন। সেগুলো পাড়াগেঁয়ে ছড়ার অত্যন্ত নীচের তলার। দুই একটা নমুনা দিই :
>
> এক যে ছিল বেদের মেয়ে এল পাড়াতে
> সাধের উল্কি পরাতে।
> আবার উল্কি পরা যেমন তেমন,
> লাগিয়ে দিল ভেল্কি
> ঠাকুর ঝি।
> উল্কির জ্বালাতে কত কেঁদেছি
> ঠাকুর ঝি।।

আরো কিছু ছেঁড়া ছেঁড়া লাইন মনে পড়ে, যেমন—

চন্দ্র সূর্য হার মেনেছে, জোনাক জ্বালে বাতি
মোগল পাঠান হদ্দ হল, ফার্সি পড়ে তাঁতি।

[রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯৯ : ১৭৬]

ছড়া গান দিয়ে সঙ্গীত চর্চা শুরু হয়; সেই সঙ্গে পাঁচালি গানও শুনতেন মহর্ষির অনুচর কিশোরী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। রবীন্দ্র-জীবনী পাঠক মাত্রেরই তা জানা আছে। পরবর্তীকালে কর্মসূত্রে পূর্ববঙ্গে বসবাস কালে (১৮৯১-১৯০১) ও বীরভূমের গৈরিক প্রান্তরে উদাস-করা মেঠোসুরের সঙ্গে কবির নিবিড় পরিচয় হয়। লোকসঙ্গীতের প্রতি কবির আগ্রহের প্রথম লিখিত প্রকাশ দেখতে পাই ১৮৮৩ সালে। একটি বাউল সংগ্রহ গ্রন্থের সমালোচনা লিখেন কবি মাত্র ২২ বছর বয়সে। উক্ত সমালোচনায় কবি আত্মকথার মতা করে লিখলেন :

আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করতে চাই, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।

বিশ্বপ্রেমের চেতনা যে পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ নয়, আমাদের স্বদেশ চিত্ত থেকে স্বতঃউৎসারিত বাউল ফকিরের গানে তা প্রকাশ পেয়েছে—কবি গভীর বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন :

Universal love প্রভৃতি বড় বড় কথা বিদেশীদের মুখ হইতে বড়োই ভালো শুনায়, কিন্তু ভিখারীরা আমাদের দ্বারে দ্বারে সেইকথা গাহিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের কানে পৌঁছায় না কেন [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯৯ : ২৮৯] ?

বলা বাহুল্য, বাউলের বিশ্বপ্রেমানুভূতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্তরে বিশ্বপ্রেমের স্পন্দন অনুভব করেছেন এবং সমগ্র জীবন তার অনুরণন চলেছে; এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট কাব্য, নাটক, গান ও নানা প্রবন্ধ-নিবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ যখন *গীতালি-গীতামাল্য* রচনা করেন, তখনই তাঁর মধ্যে অধ্যাত্ম চেতনার প্রবলতম প্রকাশ দেখা দিয়েছিলো বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। এই যুগে রচিত নাটকগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতে কবি একটি করে বাউল চরিত্রের অবতারণা করেছেন। বাউল তত্ত্বের উপর তিনি সেযুগের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক রচনা করেন, তার নাম *রাজা*। বৌদ্ধ আখ্যান থেকে নেয়া কাহিনী অবলম্বনে *রাজা* নাটকটি রচিত; কিন্তু বাউলের ভাবটি তার উপর আরোপ করে তাকে এক অনবদ্য সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলেছেন। লালন রচিত একটি গান আছে "সে যে কথা কয় রে দেখা দেয় না"—এই ভাবটি তিনি *রাজা*

নাটকের ভিতর দিয়ে নিজের অধ্যাত্ম ধ্যান ধারণার পরিচয়কে প্রকাশ করেছেন। *রাজা* নাটকের রাজাও বাউলের অধরার মতো। ধরা দিয়েও ধরা দেয়না। কবি নিজেও এক সময় *ফাল্গুনী* নাটকের অন্ধ বাউলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। নিজেকে 'রবীন্দ্র বাউল' রূপে পরিচয় দিতেও কবি কুণ্ঠিত হননি।

জমিদারী দায়িত্বভার নিয়ে রাজশাহী, কুষ্টিয়া অঞ্চলে বাসকালীন রবীন্দ্রনাথ বাউলের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। শিলাইদহ অঞ্চলে বাউল, ফকির, বৈষ্ণব প্রভৃতিজনের সঙ্গে কবির প্রায়ই আলাপ আলোচনা হতো। রবীন্দ্রনাথই প্রথম লালনের ২০টি গান সংগ্রহ করে মাসিক *প্রবাসীতে* প্রকাশ করেন। মাসিক *প্রবাসীতে* 'হারমনি' নামে একটি বিভাগ প্রবর্তিত হয় লোকসাহিত্য সংগ্রহ করে প্রকাশ করার জন্যে। ১৩২২, বৈশাখ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সংগৃহীত গগন হরকরার 'আমি কোথায় পাবো তারে' গানটি দিয়ে এর সূচনা হয়। বলাবাহুল্য লালন শিষ্য গগন হরকরার এই বিখ্যাত গানের সুরে রচিত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত 'আমার সোনার বাংলা' গানটি। তবে, হুবহু বাউল সুরে রচিত কবির গানের সংখ্যা খুবই কম। মাত্র কয়েকটি গান বাউল সুরে রচিত হলেও বিষয়গত ও ভাবগত দিক দিয়ে রবীন্দ্র সৃষ্ট গান নবরসে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। যেমন একটি বাউল গান (রচয়িতা অজ্ঞাত) :

আগুন আছে ছাইয়ের ভিতর
আগুন বার করে নে ছাই নেড়ে।
যদি দৈবযোগে জন্মালো আগুন
কেউ কেউ বলে রে ভাই পোড়া শোলার গুণ
আগুন ইস্পাতেতে মজুত ছিল
রে ভাই মজুত আছে পাথরে।

রবীন্দ্র ভাবাদর্শে এই গানটির রূপান্তর দাঁড়ায় :

তুমিযে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে
সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে।।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে
নাচে আগুন তালে তালে,
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে।।

রবীন্দ্র চেতনায় মুল গানটির ভাবভঙ্গি ছন্দ সুর নবরূপে উপস্থিত। 'তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে' মূল গানটির রূপান্তর শুধু নয়; জন্মান্তরও যেন ঘটে যায় [সুধীর চক্রবর্তী ১৩৯২ : ১৪৫]। শুধু গীত রচনার ক্ষেত্রেই এই রূপান্তর নয়, সুরের

দিক দিয়েও কবি সুরান্তর ঘটান আরো পরিমিতভাবে। কখনো মূল সুরের সঙ্গে রাগরাগিণীর মিশ্রণ ঘটিয়ে, কখনো বা ধ্রুপদীছন্দের ব্যবহার করে সহজ ছন্দকে বিষমপদী ছন্দে পরিবর্তিত করে। এই যে বাউল গান ও সুর নিয়ে ভাঙা-গড়া সৃষ্টি সুখের উল্লাস তার গভীরে একটি কারণ অন্তর্নিহিত আছে।

বাউল গানে রবীন্দ্রনাথ বাঙালির নিজস্ব সাংস্কৃতিক রূপের পরিচয় পেয়েছিলেন। অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গানে যে বিশ্বপ্রেমের বাণী ও মানব সম্মিলনের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে এ কথা কবি গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। বাউলের 'মনের মানুষ"-এর সঙ্গে উপনিষদের 'অন্তরতমহৃদয়মাত্মা'র প্রতিধ্বনি শুনে কবি বিস্ময় বোধ করেছিলেন। বাউলগানের ভাবদর্শন কবিকে অনুপ্রাণিত করেছে এমন শুধু নয়, বাউল গানের মধ্যে 'স্বদেশ চিত্তের যেমন একটি ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায়' তেমনি, বাউল গানে আমাদের একান্ত নিজস্ব দেশীসুরের সহজ সরল প্রকাশ কবিকে সবিশেষ আকৃষ্ট করেছে। এসম্বন্ধে কবির একটি উক্তি স্মরণীয় :

> একবার যদি আমাদের বাউলের সুরগুলি আলোচনা করিয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে আমাদের সঙ্গীতের মূল আদর্শটাও বজায় আছে, অথচ সেই সুরগুলো স্বাধীন। ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরিতে পারা যায় না। অনেক কীর্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষিয়ে গিয়াও তাহাকে স্পর্শ করে না। ...
>
> এই সুরগুলিকে কোনো রাগ কৌলীন্যের জাতের কোঠায় ফেলা যায় না বটে, তবু এদের জাতির পরিচয় সম্বন্ধে ভুল হয় না—স্পষ্ট বোঝা যায় যে এ আমাদের দেশেরই সুর, বিলিতি সুর নয় [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯৯ : ৬২]।

প্রসঙ্গক্রমে এখানে একটি বিষয় স্মরণীয় যে, বাউল গানের সুনির্দিষ্ট কোনো সুর নেই অর্থাৎ বাউল সুর বলে কোনো সুনির্দিষ্ট সুররূপ নেই। মূলত লোকসুর বিশেষত ভাটিয়ালী এবং রাগসঙ্গীতের কশৌলী ঝিঁঝিটের সুর বাউল গানে লক্ষ্য করা যায়। পদ্মাপারের বাউল গানে ভাটিয়ালী সুরের প্রাধান্য দেখা যায়।

অঞ্চলভেদে একই বাউলগান ভিন্নভাবে আঞ্চলিক সুরে তথা লোকসুরে গীত হয়। যেমন- লালন রচিত 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী' গানটি কুষ্টিয়া অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক ছন্দে শুদ্ধ স্বরে গীত হয়, আবার বীরভূমে অঞ্চলে চর্তুমাত্রিক ছন্দে ভৈরবী ঠাটে গানটি গাওয়া হয়ে থাকে। সেজন্য বাউলগানের সুনির্দিষ্ট সুররূপ বা কাঠামো নেই। রামপ্রসাদী গান যেমন রামপ্রসাদী সুরে রচিত, তার একটি সুররূপ আছে যা শুনলেই বোঝা যায় রামপ্রসাদী গান। রবীন্দ্রনাথ বাউল সুর বা বাউলের সুর বলতে প্রধানত দেশী বা লোকসুরকে বুঝিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে যে সুর গ্রহণ

করেছেন সেই গানগুলির সুরবিশ্লেষণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। *গীতবিতান* 'পূজা' পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথকৃত বিষয়বিন্যাসে 'বাউল' উপভাগে ১৩ টি গান সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কয়টি গানের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বাউল সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা ও সুরের পরিচয় পাওয়া যাবে। কেননা 'আজ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথই রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার।' কবি যে তেরোটি গান 'বাউল' হিসেবে বিষয় বিন্যাস করেছেন সেগুলি হলো :

(১) আমি কান পেতে রই,আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে (স্বরবিতান—১৫);
(২) আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় মনে আমার মনে (স্বরবিতান —৪২);
(৩) সে যে মনের মানুষ. কেন তারে বসিয়ে রাখিস নয়ন দ্বারে ? (স্বরবিতান—৩);
(৪) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে (স্বরবিতান—৪২);
(৫) আমার মন, যখন জাগলি নারে (স্বরবিতান—৪৪);
(৬) আমি তারেই জানি তারেই জানি (স্বরবিতান—৫৬);
(৭) জানি জানি তোমার প্রেমে সকল প্রেমের বাণী মেশে (স্বরবিতান—৩)
(৮) তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে টুকরো করে কাছি (স্বরবিতান —৪৩);
(৯) আমি যখন ছিলেম অন্ধ (স্বরবিতান—৪২);
(১০) আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় কোন খ্যাপা সে (স্বরবিতান —৪৩);
(১১) মন রে ওরে মন, তুমি কোন সাধনার ধন (স্বরবিতান—১);
(১২) কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস (স্বরবিতান —৩৮);
(১৩) আমারে কে নিবি ভাই, সঁপিতে চাই আপনারে (স্বরবিতান—২৮)।

এই তেরোটি গানে কবির বাউল চিন্তা চেতনার প্রকাশ যেমন আছে, তেমনি গীতবিতানের অন্যান্য পর্যায়ভূক্ত গানেও বাউল ভাবদর্শনের পরিচয় মেলে তাঁর গানের ঝরনাতলায়। উল্লেখিত গানগুলির সুর-বিশ্লেষণে কিভাবে কবি তাঁর গানে লোকসঙ্গীতের ব্যবহার করেছেন, দেখতে পাবো।

লোকসঙ্গীতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহজ সরল সুর ও ছন্দের সহজ স্বাচ্ছন্দ্য গতি। এই বৈশিষ্ট্যকে কবি তাঁর গানে গ্রহণ করেছেন সত্য, কিন্তু তাঁর সঙ্গে রাগসঙ্গীতের ধ্রুপদের মতো সঞ্চারী যুক্ত করেছেন। লোকসঙ্গীতে সাধারণত স্থায়ী ও অন্তরাগুলির সুর একরকম হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে সঞ্চারী যোগ করে সুর বৈচিত্র্য নিয়ে

এলেন। সেই সঙ্গে ধ্রুপদের শান্ত-গম্ভীর বিষমপদী ছন্দও গ্রহণ করলেন। যেমন উল্লেখিত তালিকার ৯ সংখ্যক গানটি 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ'। গানটি বিষমপদী ছন্দে রচিত ৩/২/২ ছন্দে তেওরা তালে নিবদ্ধ। সেই সঙ্গে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণও ঘটেছে। প্রাচীন সুরের সঙ্গে কোমল স্বরের ব্যবহার গানটিতে রয়েছে। এই মিশ্রণ এমন সাবলীলভাবে ঘটেছে যে, কোনো রাগরাগিণীর ধরাবাঁধা পথে নয় সব ছাপিয়ে গিয়ে গানটির মধ্যে বাউলের উদাস করা ভাবটি মূর্ত হয়ে উঠেছে। উল্লেখিত তালিকার 'আমি যখন ছিলেম অন্ধ' গানটি ব্যতীত বাকী ১২টি গান কবি রচনা করেছেন সহজ ছন্দে, ত্রিমাত্রিক ও চতুর্মাত্রিক ছন্দে। এখানে ছন্দের আলোচনাও প্রাধান্য পাচ্ছে কেননা, বাউল গান নৃত্য সম্বলিত। স্বাভাবিক ভাবেই ছন্দের প্রসঙ্গ তাই এসে পড়ে। এই ত্রিমাত্রিক-চতুর্মাত্রিক ছন্দে যে কেবল বাউল বিষয়ক গান রচনা করেছেন এমন নয়, অন্যান্য পর্যায়ের গানেও এই ছন্দে গান বেঁধেছেন। কিন্তু এখানে যেটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, গানগুলি যেমন সহজ ছন্দে রচিত তেমনি প্রাচীন সুর ও লোকায়ত কীর্তনের সুর এককথায় লোকসুর কবি ব্যবহার করেছেন সুপরিমিতিভাবে। এই গানগুলির সুর বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রতিটি গানই প্রায় শুদ্ধ স্বরে রচিত—কখনো কখনো কোমল নিখাদ ব্যবহৃত হয়েছে। রাগরাগিণীও ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু ব্যাকরণ মতে নয়। যেমন 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে' গানটি। স্বরলিপিতে (বিশ্বভারতী) বাউলের সুর ও কাহারবা তালে নিবদ্ধ বলে উল্লেখিত আছে। গানটির অংশিক স্বরলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি :

বাউলের সুর/কাহারবা

১ ০ ১ ০
II { ^স^ন্া -া -া ন্া | ন্া -া ন্া -সা I সা -া সা -া | রা -া রা -া I
কো ০ ন্ আ লো ০ তে ০ প্রা ০ ণে র্ প্র ০ দী প্

I রা -া -পা -া | মা -া -ধা -া I পা -া -পমা -মা | গা -া রা -গা I
জ্বা ০ ০ ০ লি ০ ০ ০ য়ে ০ ০০ ০ তু ০ মি ০

I সা -া -া -রা | গা -মগা রা -গরা I সা -া -া -া | -া -া (-রা -গা)} I -া -া I
ধ ০ ০ ০ রা ০য় আ ০০ স ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I { মা -া -া -া | পা -া পা -া I পা -া পা -া | পা -ধা ণা -ধা I
সা ০ ধ ক্ ও ০ গো ০ প্রে ০ মি ক্ ও ০ গো ০

I পা -া পমা -া | মগা -া রা -গা I সা -া -া -রা | গা -মগা রা -গরা I
পা ০ গ ল্ ও ০গো ০ ধ ০ ০ ০ রা ০য় আ ০০

I সা -া -া -া | -া -া (-া -া) } I -রা -গা II
স ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

গানটিতে শুদ্ধ স্বরের প্রাধান্য আছে শুধু শুদ্ধ নিখাদ ও কোমল নিখাদের ব্যবহারে এই স্বরবিন্যাস রাগসঙ্গীতের কর্শৌলী ঝিঁঝিটের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা বাংলা লোকসঙ্গীতে সমধিক প্রচলিত ও ব্যবহৃত হয়। আগেই বলেছি, বাউলের সুর বলে সুরের কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ নেই। লোকসঙ্গীতের ভাটিয়ালীর সঙ্গে এর সাযুজ্য রয়েছে। তবে ভাটিয়ালীর সার্বজনীন যে রূপ, যেমন :

সা রা মা মা । পা পা ধা ণধা -পা
ণধা পমা পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া ।
ধ্া সা সা । রা গা রা । গা রা সা

অবরোহণে পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া । 'মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম- ভাটিয়ালীর 'পকড়' বা প্রাণ সেখানেই।' এই সার্বজনীন রূপটিই বাংলা লোকসঙ্গীতে প্রাধান্য বিস্তার করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এই লোকসুরের সার্বজনীন রূপটিকে নিয়ে আসেন ভিন্নভাবে। উদারার ধৈবতে বিরাম না এনে কবি শুদ্ধ নিখাদে শুরু করেন এবং বিরামও নেন শুদ্ধ নিখাদে। 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' গানটির স্বরলিপি দেখলেই তা স্পষ্ট হয়। এবং লোকসুরের সঙ্গে কবি সুরারোপিত গানের স্বাতন্ত্র্য সুস্পষ্ট হয়।

কবি সম্পাদিত *গীতবিতানের* বিষয়বিন্যাসে 'বাউল' নির্দেশিত তেরোটি গানে আরো একটি দিক লক্ষ করার মতো। এই গানগুলিতে প্রাচীন সুর ও প্রচলিত কীর্তনের সুর কবি ব্যবহার করেছেন। যেমন 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়' (প্রায়শ্চিত্ত, স্বরবিতান - ৯) এবং আমারে কি নিবি ভাই (স্বরবিতান - ২৮) গান দুটি। 'আমারে কে নিবি ভাই' গানটি 'কীর্তনের সুর' বলে *স্বরবিতানের* শীর্ষদেশে উল্লেখ আছে এবং 'আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায়' গানটি 'বাউলের সুর'-এ রচিত বলে *স্বরবিতানে* উল্লেখিত আছে। এই দুটি গানের অংশবিশেষের স্বরলিপি এখানে উল্লেখ করছি যাতে 'কীর্তনের সুর' ও 'বাউলের সুর'-এর সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করা যাবে :

(১) আমারে কে নিবি ভাই গানটির স্বরলিপি (*স্বরবিতান* ২৮) :
কীর্তনের সুর/দাদরা

|পা |পা পা -ধা II { মপা -মা পা |পা পা -ধা I
আ মা রে ০ কে ০ নি বি ভা ই

I মা পা -ধা | পধপা মা -গা I রা গা -া |মা পা -া I
সঁ পি ০ তে০ চা ই আ প ০ না রে ০

I -পা -ধনা না | না ধা -নধা I (-পা -া পা | পা পা -ধা) } I
০ ০০ আ মা রে ০০ ০ ০ আ মা রে ০

I -পা -া পা | ধা ধা -র্সা I { র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I
০ ০ আ মার্‌ এ ই ম ন্‌ গ • লি য়ে ০

I (-া -পা পা |ধা ধা -র্সা) } I নর্সা -া র্সা |র্সরা র্সা -র্রা I
০ ০ আ মার্‌ এ ই কা জ্‌ ভু লি০ য়ে ০

I না -া র্সা | না ধা -না I পা পা -ধা |ধা না -র্সা I
স ঙ্‌ গে তো দে র্‌ নি য়ে ০ যা রে ০

I -ধনর্সা -া নর্সা | ধনা ধা -পা I -া -া পা |পা পা -ধা II
০০ ০ আ মা রে ০ ০ ০ "আ মা রে ০"

(২) আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় গানটির স্বরলিপি : (স্বরবিতান-৯);
বাউলের সুর/দাদরা।

পা | পা পা -া II { মা মা -ধা |পা পা -া I মা পা পা | গা মা -গা I
আ মা রে ০ পা ড়া য়্‌ পা ড়া য়্‌ খে পি য়ে বে ড়া য়্‌

I রগা -রা গা |মা পা -া I (-ধনা -া না |ধা পা -া) } I
কো ন্‌ খে পা সে ০ ০০ ০ আ মা রে ০

I -া -া -া | -া পা ধা I ধা ধা -র্সা | র্সা র্সা -া I
০ ০ ০ ০ ও রে আ কা শ্ জু ড়ে ০

I র্সা র্সা -া | র্রা র্সা -া I র্সা -া র্সনা | না ধা -পা I
মো হ ন্ সু রে ০ কী ০ যে বা জে ০

I পা -া ধা | ধা না -া I -ধা -না ধা | পা পা -া II
কো ন্ বা তা সে ০ ০ ০ "আ মা রে ০"

II { -া -া সা | সা রা -মা I মা মা -পা | পা পা -া I
০ ০ গে ল রে ০ গে ল ০ বে লা ০

I -া -া পা | ধা র্সা -া I না র্সা -না | না ধা -না I
০ ০ পা গ লে র্ কে ম ন্ খে লা ০

I -ধা -পা পা | দা ণা -দপা I পা পদা -ণা | দা পা -মপা I
০ ০ ডে কে সে ০০ আ কু০ ল্ ক রে ০০

I গা -মগা মা | মা পা -া } I { -া -া -া | -া পা ধা I
দে ০য় না ধ রা ০ ০ ০ ০ ০ তা রে

I ধা র্সা -া | র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -া | র্রা র্রর্সা -া I
কা ন ন্ গি রি ০ খুঁ জে ০ ফি রি ০

I না র্সনা -া | না ধা -পা I পা -া ধা | ধা না -া } I
কেঁ দে ০ ম রি ০ কো ন্ হু তা শে ০

I -ধা -না ধা | পা পা -া II II
০ ০ "আ মা রে ০"

'বাউলের সুর' ও 'কীর্তনের সুর'-এ রচিত গান দুটির স্বরবিন্যাস প্রায় একই রকম ছন্দে রচিত অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক ছন্দে দাদরা তালে নিবদ্ধ। 'কীর্তনের সুর' এর সঙ্গে 'বাউলের সুর'-এর তফাৎটুকু এখানে দেখা যায় যে, কীর্তনের সুরে সম্পূর্ণ

শুদ্ধস্বরের ব্যবহার আর বাউলের সুরে রচিত গানটির 'ডেকে সে আকুল করে' এই অংশটুকুতে কোমলস্বর যথাক্রমে কোমল ধৈবত ও কোমল নিখাদ স্বর দুটি ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মূল সুররূপ একই রকম। এখানে বাংলায় প্রচলিত প্রাচীন সুর কবি গ্রহণ করেছেন যাকে আমরা লোকসঙ্গীত বা লোকসুরের অন্তর্ভুক্ত করেছি। অবিকল এই সুরে একটি প্রাচীন বাউল গান আছে এবং তাতে রবীন্দ্রনাথ সুরারোপিত গানের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাচীন বাউল গানটির স্বরলিপি এই রকম :

+　　　　০　　　　+　　　　০
I পা পা পা | -া -া -া I -া -া না | ধা পা ধা I
দে খে ছি　০ ০ ০　০ ০ দে　খে ছি ০

II মা মা ধা | পা পা ধা I মা পা ধপা | মা গা মা I
রূ প সা　গ রে ০　ম নে ০র　মা নু ষ

I গা -রা গা | মা পা -া I -পধা -না -না | ধা পা -া I
কাঁ ০ চা　সো নো ০　০০ ০ দে　খে ছি ০

I -া -া -া | -া পা ধা I ধর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
০ ০ ০　০ তা রে　ধ রি ০　ধ রি ০

I র্সা র্সা -া | র্রা র্সা -না I না না র্সা | না ধা -না I
ম নে ০　ক রি ০　ধ র তে　গে লে ম

I পধা পা ধা | না ধা -পা I -পধা -না না | ধা পা -ধা II
আ র পে　লাম্ না ০　০০ ০ দে　খে ছি ০

II -া -া রা | মা মা -া I মা মা -পা | -পা -পা -া I
০ ০ প　থিক্ ক য়　ভে বো ০　না রে ০

I -া -া পা | ধা র্সা র্সা I না না র্সা | না ধা -না I
০ ০ ডু　বে যা ও　রূ প সা　গ রে ০

I -ধা -পা পা | পা নধা -পা I পা পা না | ধা পা -মা I
০ ০ বি　র লে০ ০　ব সে ০　ক রো ০

I গমা গা গা | মা পা -া I -া -া -া | -া পা ধা I
যো০ গ সা ধ না ০ ০ ০ ০ ০ এক্ বার

I ধর্সা র্সা া | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা -া | র্সা র্রা র্সা I
ধ০ র তে পা র লে ম নে র মা নু ষ I

I না না -র্সা | না ধা না I পধা পা ধ | া ধা পা I
ছে ড়ে ০ যে তে ০ আ০ র দি য়ো না ০

I -পধা -না -না | ধা পা -ধা II
০০ ০ দে খে ছি ০

প্রাচীন সুরে রচিত এই গানের সুর রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে আরো পরিমিতরূপে গ্রহণ করেছেন। যেমন :

(১) ভেঙে মোর ঘরের চাবি,
(২) আমারে কে নিবি ভাই,
(৩) আমাদের ভয় কাহারে প্রভৃতি গানে।

এই প্রাচীন সুরে কবি গান রচনা করেছেন এবং এক্ষেত্রে 'বাউলের সুর' ও 'কীর্তনের সুর' কে চিহ্নিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে। কেননা উভয় সুরই মূলত প্রাচীন সুর অবলম্বনে রচিত। যে কারণে বাউলের সুর, কীর্তনের সুর এবং প্রাচীন সুরকে এককথায় 'লোকসুর' হিসেবে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

পূজা পর্যায়ে সন্নিবেশিত ১৩টি বাউল গানের সুর বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ শুদ্ধ স্বর, কোমল গান্ধার, কোমল নিখাদ ও কোমল ধৈবতের প্রয়োগ মাঝে মাঝে ঘটেছে। লোকসঙ্গীতের সহজ ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। সেই সঙ্গে রাগ-রাগিণী ও কোমল স্বরের প্রয়োগ থাকলেও সুরের অবাধ গতি কথা ও সুরের সাথে মিলে মিশে গেছে। পূজা পর্যায়ের এই ১৩টি গান ব্যতীত গীতবিতানের অন্যান্য পর্যায়ে বাউলের গানেও লোকসুরের পরিমিত প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

লোকসঙ্গীতের মধ্যে অন্যতম বাউল গান। রবীন্দ্রনাথ এই বাউল গান থেকেই সবিশেষ প্রেরণা লাভ করেছিলেন। যে জন্য লোকসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনায় প্রথমত বাউলগানকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও লোকসঙ্গীতের সুর বলতে বাউল গানকেই বুঝিয়েছেন। বাংলার অবহেলিত এই অকৃত্রিম হৃদয়ের গানের প্রতি কোনো সাময়িক ভাবাবেগ নয়, তাঁর গভীর অনুরাগের প্রকাশ গানে, কবিতায় ও নানা প্রবন্ধ নিবন্ধে কবি অকুণ্ঠচিত্তে প্রকাশ করেছেন। এখানে কবির একটি উক্তি স্মরণীয় :

আমার লেখা যারা পড়েছেন তাঁরা জানেন বাউল পদাবলীর প্রতি আমার অনুরাগ আমি অনেক লেখায় প্রকাশ করেছি। শিলাইদহে যখন ছিলাম, বাউল দলের সঙ্গে আমার সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ আলোচনা হত। আমার অনেক গানে অন্য রাগরাগিণীর সঙ্গে আমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বাউল সুরের মিলন ঘটেছে। এর থেকে বোঝা যাবে বাউলের সুর ও বাণী কোন এক সময়ে আমার মনের মধ্যে সহজ হয়ে মিশে গেছে [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৯৯ : ৩১১]।

বাউলগানের তত্ত্বদর্শন ও সুর কবি রবীন্দ্রনাথের জীবনসাধনার মধ্যে এমনভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলো যে, বাংলার অন্য কোনো গানই তেমন রেখাপাত করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের 'প্রাণের মানুষ' ও বাউলের 'মনের মানুষ' এক হয়ে মিশে গেছে। সুরের দিক দিয়েও বাউলের গান ও রবীন্দ্রনাথের গানের মিলন ঘটেছে সহজভাবেই যদিও এ সাদৃশ্য স্বল্পসংখ্যক গানে লক্ষ করা যায়। হুবহু বা অবিকল লোকসুরে রচিত গানের সুরে মাত্র কয়েকটি গান বেঁধেছেন, রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিভাষায় যাকে মূলগান থেকে রচিত ভাঙা গান বলা হয়। যেমন :

মূল গান	ভাঙা গান
১। আমি কোথায় পাব তারে	আমার সোনার বাংলা
২। ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবে	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক
৩। আমার সোনার গৌর কেনে	ও আমার দেশের মাটি
৪। মন মাঝি সামাল সামাল	এবার তোর মরা গাঙে
৫। হরি নাম দিয়ে জগত মাতালে	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
৬। চাচঁর চিকর আধো (বাংলা, কাফি-কানাড়া)	বেঁধেছ প্রেমের পাশে।

লোকসুর থেকে এই ছয়টি গান ভেঙেছেন রবীন্দ্রনাথ। এ ছাড়া কবির অনেক গান আছে যেখানে লোকসুরের সঙ্গে রাগ-রাগিণী ও ধ্রুপদ আঙ্গিকের মিলন ঘটেছে এবং সঞ্চারীতে এনেছেন সুর বৈচিত্র্য। ধ্রুপদের শান্ত গম্ভীর রসের মধ্যে বাউলের উদাস করা ভাবটি আরোপ করেছেন। তাতে করে প্রচলিত বাউল গান থেকে তাঁর গান স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

সুরের দিকে সমধর্মিতা লক্ষ করা গেলেও মূল গান ও কবি রচিত গানের মধ্যে ভাবের দিক থেকে আকাশ-পাতাল পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, অবিকল লোকসুরে কবি যে গান রচনা করেছেন তার মূলে আছে স্বদেশপ্রেম। লোকসঙ্গীতের বিচিত্রধারা—বাউল, ভাটিয়ালী, মাটির সুর কবি গ্রহণ করেছেন যেহেতু তা একান্তই আমাদের নিজস্ব দেশের সুর। এই দেশীসুর বা

লোকসুরে কবি যে কয়টি গান ভেঙে রচনা করেছেন বিষয়গত দিক দিয়ে দেখা যাচ্ছে তা স্বদেশ প্রেমের গান, *গীতবিতানের* 'স্বদেশ' পর্যায়ে যা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই লোকসুরের ব্যঞ্জনাকে কবি নিয়ে আসেন ভিন্নরূপে, স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত করতে আপন সুরকে কবি কাজে লাগিয়েছেন উদ্দীপনার সুরে রূপান্তরিত করে। এখানে স্বদেশের প্রতি কবির মমত্ববোধের পরিচয় ফুটে উঠে। বঙ্গভঙ্গ রদ্ (১৯০৫ সাল) আন্দোলনকালে রচিত গানগুলি কবি দেশীসুর বা লোকসুরেই বেঁধেছেন। *স্বরবিতান* ৪৬-এ অন্তর্ভুক্ত গানগুলি বিশেষত লোকসুরে রচিত। সেখানে লোকসঙ্গীত বা পাশ্চাত্যসুর কবি গ্রহণ করেননি। কবির স্বাজাত্যপ্রীতি ও দেশের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় এই সময়কার রচিত গানে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

গীতবিতানের কালানুক্রমিক সূচী [১ম ও ২য় খণ্ড, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ১৩৮০ : ৩৮৫] অনুসারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা ২২৩২টি। তার মধ্যে যে গানগুলি বাউল বা বাউলের সুর বলে নির্দেশ করা আছে এবং বিভিন্ন সময়ে লোকসুরে রচিত গানগুলির একটি তালিকা রচনাকালসহ এখানে উপস্থাপন করছি :

	গানের প্রথম ছত্র	রচনাকাল	স্বরবিতান
১।	ওগো তোমরা সবাই ভালো (বাউলের সুর)	৩১ বছর বয়সে	৫
২।	ক্ষ্যাপা তুই আছিস আপন (বাউলের সুর)	৩১ বছর বয়সে	৫১
৩।	আমার নাই বা হল পারে যাওয়া (বাউলের সুর)	৪৪ বছর বয়সে[১]	১০
৪।	এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
	(সারি গানের সুর)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
৫।	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে (বাউলের সুর)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
৬।	আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
৭।	মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
৮।	তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
৯।	ছি ছি, চোখের জলে ভেজাসনে আর মাটি	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
	(বাউলের সুর)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১০।	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১১।	যে তোরে পাগল বলে (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১২।	ওরে তোরা নেই বা কথা বললি (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১৩।	যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১৪।	আপনি অবশ হলি (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৫১
১৫।	ও জোনাকী, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ	৪৪ বছর বয়সে	৫২
	(বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১৬।	বাংলার মাটি, বাংলার জল (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬

১৭।	বিধির বাঁধন কাটবে তুমি (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১৮।	ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
১৯।	সার্থক জনম আমার জন্মেছি (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
২০।	আমরা পথে পথে যাব সারে সারে (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
২১।	আমার সোনার বাংলা (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
২২।	ও আমার দেশের মাটি (বাউল/বাউলের সুর)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
২৩।	ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	স্ব. নে[২]
২৪।	নিশিদিন ভরসা রাখিস্ (বাউল/বাউলের সুর)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
২৫।	বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
২৬।	আমি ভয় করব না (বাউল)	৪৪ বছর বয়সে	৪৬
২৭।	তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার (বাউলের সুর)	৪৪ বছর বয়সে	২৬
২৮।	আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় (বাউলের সুর)	৪৭ বছর বয়সে	৫০
২৯।	ওর মানের এ বাঁধ টুটবে নাকি (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৯
৩০।	আমরা বসব তোমার সনে (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৯
৩১।	বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৯
৩২।	আমারে পাড়ায় পাড়ায় খেপিয়ে বেড়ায় (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৯
৩৩।	রইল বলে রাখলে কারে (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৯
৩৪।	ওরে, আগুন আমার ভাই (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৯
*৩৫।	গ্রামছাড়া এই রাঙা মাটির পথ (যদিও কোন লোকসুরের উল্লেখ নেই, কিন্তু ভাটিয়ালীর ছাপ আছে)	৪৮ বছর বয়সে	৯
*৩৬।	শরতে আজ কোন্ অতিথি এল (কীর্তনের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৫০
*৩৭।	ওই আসনতলের মাটির পরে (কীর্তনের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৩৭
৩৮।	রূপ সাগরে ডুব দিয়েছি (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৩৮
৩৯।	কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৩৮
৪০।	তুমি এবার আমায় লহো হে নাথ (বাউলের সুর)	৪৮ বছর বয়সে	৩৮
৪১।	যেথায় তোমার লুট হতেছে ভুবনে (বাউলের সুর)	৪৯ বছর বয়সে	৩৭
*৪২।	আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে (বাউল দলের গান)	৪৯ বছর বয়সে	৪২
*৪৩।	বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে (সুরের উল্লেখ নেই যদিও কিন্তু ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব আছে)	৪৯ বছর বয়সে	৪২
৪৪।	যা ছিল কালো ধলো (বাউল দলের গান)	৪৯ বছর বয়সে	৪২
৪৫।	তোমার খোলা হাওয়া (পূজা/বাউল)	৫৩ বছর বয়সে	৪৩
৪৬।	ও আমার মন যখন জাগলি নারে (পূজা/বাউল)	৫৩ বছর বয়সে	৪৪
*৪৭।	তোমায় নতুন করে পাব বলে (বাউলের গান)	৫৩ বছর বয়সে	৭

*৪৮।	সবাই যারে সব দিতেছে (বাউলের গান)	৫৩ বছর বয়সে	৭
*৪৯।	হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে (বাউলের গান)	৫৩ বছর বয়সে	৭
*৫০।	ভেঙে মোর ঘরের চাবি (সুরের উল্লেখ নেই, কিন্তু প্রাচীন সুর গানটিতে ব্যবহৃত হয়েছে)	৫৬ বছর বয়সে	৩৪
৫১।	বলো, বন্ধু বলো তিনি তোমার কানে কানে (বাউল সুরের নির্দেশসহ গানটি প্রকাশিত হয়)	৫৬ বছর বয়সে	স্ব.নে.
৫২।	আমি তারেই খুঁজে বেড়াই (পূজা/বাউল)	৫৭ বছর বয়সে	৪২
৫৩।	ভুলে যাই থেকে থেকে (মুক্তধারা, সুরের উল্লেখ নেই)	৬০ বছর বয়সে	৫২
৫৪।	ওতো আর ফিরবে নারে (বাউলের গান, মুক্তধারা) 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের গানের রূপান্তর 'আমি ফিরব নারে'। (স্বর- ৯)	৬০ বছর বয়সে	৫২
*৫৫।	আমি মারের সাগর পাড়ি দেব (সুরের উল্লেখ নেই, 'মুক্তধারা' নাটকের গান। ভাটিয়ালী সুরের প্রভাব আছে)	৬০ বছর বয়সে	৫২
*৫৬।	তোর শিকল আমায় বিকল করবে না ('মুক্তধারা', সুরের উল্লেখ নেই)	৬০ বছর বয়সে	৫২
*৫৭।	ফিরে চল্ মাটির টানে (বিবিধ, সুরের উল্লেখ নেই। লোকসুরের প্রভাব আছে)	৬০ বছর বয়সে	১৫
*৫৮।	আমি কান পেতে রই (পূজা/বাউল)	৬১ বছর বয়সে	১৫
*৫৯।	বাদল বাউল বাজায় রে একতারা (সুরের উল্লেখ নেই)	৬১ বছর বয়সে	১৫
*৬০।	পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে (সুরের উল্লেখ নেই)	৬২ বছর বয়সে	৩০
৬১।	সে যে মনের মানুষ (পূজা, বাউল)	৬৪ বছর বয়সে	৩০
*৬২।	খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে ('তাসের দেশ', সুরের উল্লেখ নেই)	৬৬ বছর বয়সে	৩
৬৩।	জানি জানি তোমার প্রেমে (পূজা/বাউল)	৬৬ বছর বয়সে	৩
৬৪।	আমি যখন ছিলেম অন্ধ (পূজা/বাউল)	৭১ বছর বয়সে	৪২
*৬৫।	না না না, ডাকব না (সুরের উল্লেখ নেই কিন্তু বাংলায় প্রচলিত প্রাচীন সুরের সঙ্গে সাজুয্য আছে)	৭২ বছর বয়সে	১
৬৬।	আমি তারেই জানি তারেই জানি (পূজা/বাউল)	৭২ বছর বয়সে	৫৬
*৬৭।	মাটি তোদের ডাক দিয়েছে ('চণ্ডালিকা', ফসলকাটার আহ্বান গান)	৭৬ বছর বয়সে	১৮
*৬৮।	অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে (গীতবিতান ২/প্রেম, সুরের উল্লেখ নেই)	৭৭ বছর বয়সে	৬২

উপরোক্ত তালিকায় কালানুক্রমিক সূচি অনুসারে লোকসুরে রচিত গানের উল্লেখসহ আরো কিছু গান সংযুক্ত হয়েছে যেগুলি তারকাচিহ্ন দ্বার সনাক্ত করেছি। এই গানগুলিতেও লোকসুর ব্যবহৃত হয়েছে। কালানুক্রমিক সূচিতে বাউল/বাউলের গান/বাউলের সুর হিসেবে নির্দেশিত কয়েকটি গানের স্বরলিপি (অংশবিশেষ) নিম্নে উল্লেখ করছি। তাতে করে এটি বোঝা যাবে, লোকসুরে কবি যে গান রচনা করেছেন তার বৈশিষ্ট্য এবং সুরস্রষ্টা হিসেবে তার গানের স্বকীয়তার পরিচয়। অর্থাৎ হুবহু লোকসুর ব্যবহার না করে তার মধ্যে নতুনত্বের পরিচয় ফুটে উঠে। এই তালিকা থেকে আরো একটি বিষয় লক্ষ করার মতো যে, এই লোকসুরে গীতরচনা কোনো বিশেষ বয়সের রচনা নয়, মৌলিক রচনার সঙ্গে সমগ্রজীবনেই কবি সুর নিয়ে ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে তাঁর সৃজনশীলতার পথ তৈরি করে নিয়েছেন।

এবারে আসা যাক্ কবির লোকসুরে রচিত গানের সুর বিশ্লেষণে। উল্লেখিত তালিকার ১ সংখ্যক গান 'ওগো তোমরা সবাই ভালো' গানটি 'বাউলের সুর' বলে নির্দেশ করা আছে, গানটির স্বরলিপি বিশ্বভারতী প্রকাশিত *স্বরবিতান* ৫-এ আছে। গানটির স্বরলিপি এই রকম :

বাউলের সুর/দাদরা

মা গা -মা II { রা -া -গা | মা -পা -া I (-া -া পা | -না ধা -পা I
ও গো ০ তো ০ ম্ রা ০ ০ ০ ০ স ০ বা ই

I মা -পা মগা | -া গা গা)} পা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা I
ভা ০ লোং ০ ও গো যা র অ দৃ ষ্ টে

I না -া র্রা | র্সা র্সা -র্রা I র্সনা -া -া | -া না না I
যে ম্ নি জু টে ০ ছে ০ ০ ০ ও গো

I {না -র্সা র্সা | র্সা র্সা -না I ধনা -া ধপা | (-া না না)} I মা গা -মা II
সে ই আ মা দে র্ ভা০ ০ লো ০ ও গো "ও গো ০"

II সা সা -মা | মা মা -া I মা পা -া | মা গা -া I
আ মা ০ দের্ এ ই আঁ ধা র্ ঘ রে ০

I মা মা -ণা | ধা পমা -া I মা -ণা ণা | ধ পা -ধা I
আঁ ধা র্ ঘ রে০ ০ স ন্ ধ প্র দী প্

I মা -পা মগা | গা গা -মা II
জা ০ লো "ও গো ০"

তালিকার ৩ সংখ্যক গান 'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া' গানটি স্বরলিপিতে (স্বরবিতান-১০) বাউলের সুর এবং দাদরা তালে নিবন্ধ বরে উল্লেখ আছে। স্বরলিপি নিম্নরূপ :

বাউলের সুর/দাদরা

গা গা II { গা -মা পা | -ধা না -র্সনা I ধনা -পা -া | মা গা -মগা I
আ মার্ না ই বা ০ হ ০০ ল০ ০ ০ পা রে ০০

I রা -পা -া | -মা -পা -মা I (গা -া -া | -া গা গা)} I
যা ০ ০ ০ ০ ও য়া ০ ০ ০ আ মার্

I গা -া না | না না না I র্সা -না র্রা | র্সা র্সা -র্রর্সা I
য়া ০ যে হাও য়া তে চ ল্ ত ত রী ০০

I না -র্সা না | ধা পা -ধপা I মপা গা -া | মা পাঃ -মঃ II
অ ঙ্ গে তে সে ০ই লা০ গা ই হাও য়া ০
-া | -া -া -া I
০ ০ ০ ০

II { র্সা -া র্জ্ঞা | র্রা র্রা -া I র্রা -া র্রা | র্রা র্রা -র্সা I
নে ই য দি বা ০ জ ম্ ল পা ড়ি ০

I র্রা -া র্মা | র্জ্ঞা র্জ্ঞা -র্রা I র্সা -না র্রা | র্সা র্সা -র্রর্সা I
ঘা ট্ আ ছে তো ০ ব স্ তে পা রি ০০

I (-নর্সা -না -া | -া -া -া) } I -নর্সা -না -া | -া না না I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ আ মার্

I না র্সা -া র্সা র্সা -া I না -া র্রা র্সা র্সা -র্রর্সা I
আ শা র্ ত রী ০ ডু ব্ ল য দি ০০

I না -র্সা না | ধা পা -ধপা I মপা গা -া | মা পাঃ -মঃ II
দে খ্ ব তো দে ০র্ ত০ রী ০ বাও য়া ০

এবারে তালিকার ৯ সংখ্যক গানটি 'ছি ছি চোখের জলে' এর অংশবিশেষ স্বরলিপি এখানে তুলে দিচ্ছি :

গা গা II রা গা -া | মা পা -া I ^প^না না -া | ধা পা -ধপা I
ছি ছি চো খে র্ জ লে ০ ভে জা স্ নে আ ০র্

I মা -পা মা | -গা গা গা I রা গা -া | মা পা -া I
মা ০ টি ০ ছি ছি চো খে র্ জ লে ০

I -া -া -া | -া র্সা র্সা I র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I
০ ০ ০ ০ এ বার্ ক ঠি ন্ হ য়ে ০

I র্সা -না র্রা | র্সা র্সা -র্রর্সা I -নর্সা -না -া | -া -া -া I
থা ক্ না ও রে ০০ ০০ ০ ০ ০ ০ ০

I -া -া -া | { -া না না I না -া র্সা | র্সা র্সা -না I
০ ০ ০ ০ জো রে বো ক্ খো দু য়া র্

I ^ধ^না -া পা } | -া মা গা II
আ ০ টি ০ "ছি ছি"

-া -া II গা গা -া | গা গা -মা I মা মা পা | মা পা -া I
০ ০ প রা ন্ টা কে ০ গ লি য়ে ফে লে ০

I মা -া ধা | পা পা -ধপা I মা গমা -পা | মা মা -পমা I
দি স্ নে রে ভা ই০ প থে০ ০ ঢে লে ০০

I গা -া মগা | রা -পা মা I পধপা -া -া | -া না না I
মি ০ থে০ অ ০ কা জে০০ ০ ০ ০ ও রে

I { না র্সা -া | র্সা র্সা -া I র্সা -নর্সা র্রা | র্সা র্সা -র্রর্সা } I
নি য়ে ০ তা রে ০ চ ০র্ বি পা রে ০০

I -নর্সা -না -া | -া -া -া I -া -া -া | { -া না না I
০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প থের্

I না র্সা -া | র্সা র্সা -না I ধনা -া পা } | -া মা গা II
ক ত ই বা ধা ০ কা ০ টি ০ "ছি ছি"

এবারে তালিকা থেকে গানগুলির স্বরলিপির অংশবিশেষ উল্লেখ করবো, যেগুলি শুধু 'বাউল' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তালিকার ৮ সংখ্যক 'তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে' গানটি 'বাউল' বলে নির্দেশ করা আছে। গানটির স্বরলিপি এই রকম :

ন্‌ধ্‌া II { প্‌া সা -া | সা সা -রা I গা -া গপা | পা গা -া I
তোর্ আ প ন্ জ নে ০ ছা ড়্ বে তো রে ০

I -া -া গা | রা সা -ন্‌া I ধ্‌া -সা সা | সা সা -রা I
০ ০ তা ব লে ০ ভা ব্ না ক রা ০

I সরা -গা রা | সা -া -া I -া -া -া | (-া -া ন্‌ধ্‌া) } I -া পা পা I
চ০ ল্ বে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ তোর্ ০ ও তোর্

I {পা ধা -া | র্সা না -া I ধা -া পা | ধা পা -া I
আ শা ০ ল তা ০ প ড়্ বে ছিঁ ড়ে ০

I মপা -া মা | গা রা -গরা I সা -রা রা | (গা পা পা)} I গা -া -া I
হ য়্ তো রে ফ ০ল্ ফ ল্ বে না ওতোর্ না ০ ০

I গধা -া পা | গা রা -গরা I সা -রা রা | সরগা -া -া I
হ য়্ তো রে ফ ০ল্ ফ ল্ বে না০০ ০ ০

I -া -া গা | রা সা -ন্‌া I ধ্‌া -সা সা | সা সা -রা I
০ ০ তা ব লে ০ ভা ব্ না ক রা ০

I সরা -গা রা | সা -া -া I -া -া -া | -া -া ন্‌ধ্‌া II
চ০ ল্ বে না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ "তোর্"

'বাউল' হিসেবে উল্লেখিত আরেকটি গানের স্বরলিপি এখানে দিচ্ছি। তালিকার ১৮ সংখ্যক 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' (স্বরবিতান ৪৬) গানটির স্বরলিপি নিম্নরূপ :

সা ন্‌া II সা সা -া | গা গা -া I সা -া সা | গা গা -া I
ও দের্‌ বাঁ ধ ন্‌ য ত ই শ ক্‌ত হ বে ০

I {মা পা -া | মা মা -গা I রগা -া সা | (গা গা -া)} I -া সা সা I
ত ত ই বঁ ধ ন্‌ টু ট্‌ বে মো দের্‌ ০ ০ ও দের্‌

I সা সা -পা | পা পা -া I পা -া পা | পা পা -ধা I
য ত ই আঁ খি ০ র ক্‌ ত হ বে ০

I ণা র্সা -া | ণা ণা -ধা I পধা -া পা | মা গরা -গা I
মো দে র্‌ আঁ খি ০ ফু ট্‌ বে ত ত০ ই

I মা পা -া | মা মা -গা I রগা -া সা | -া সা ন্‌া II
মো দে র্‌ আঁ খি ০ ফু ট্‌ বে ০ "ও দের্‌"

-া -া -া II {পা -া পা | না না -া I র্সা -া র্সা | র্সা র্সা -া I
০ ০ ০ আ জ্‌ কে যে তো র্‌ কা জ্‌ ক রা চা ই

I র্সা -া র্সা | র্রা র্সা -া I না না -পা | (ধা না -া)} I ধা না -া I
স্ব প্‌ ন দে খা র্‌ স ম য়্‌ তো না ই তো না ০

I -া -া -া । -া না না I র্সা র্সা -র্গা । র্রা র্সা -া I
০ ০ ই ০ এ খন্‌ ও রা ০ য ত্‌ ই

I না -া না | পা পা -া I পধা -ণা ণা | ধা পা -ধপা I
গ র্‌ জা বে ভা ই ত০ ন্‌ দ্রা ত ত ০ই

I মপা -া মা | গা গরা -গা I গমা -পা পা | মা মা -গা I
ছু ট্‌ বে মো দে০ র্‌ ত০ ন্‌ দ্রা ত ত ই

I রগা -া সা | -া সা ন্‌া II
ছু ট্‌ বে ০ "ও দের্‌"

বাউলের সুরে ও দাদরা তালে রচিত 'আমার নাইবা হল পারে যাওয়া", গানটিতে কোমল গান্ধার ব্যবহার করেছেন, বাকী সব স্বর শুদ্ধ। ধ্রুপদের মতো চারটি তুক্ বা কলিতে বিভক্ত। অন্তরা এবং আভোগে একই সুর ব্যবহৃত, সঞ্চারীতে কবি বৈচিত্র্য ঘটালেন। পুরো গানটিতে সহজ ছন্দের সঙ্গে সহজ সুরের সমন্বয়, যা লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু লোকগীতির প্রচলিত সুর যেমন স্থায়ী ও অন্তরা, সঞ্চারীর ব্যবহার নেই। লোকগীতিতে সাধারণত পর পর অন্তরাগুলি একই সুরে গীত হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাউলের সুরে রচিত গানে প্রচলিত সুর বা পুনরাবৃত্ত সুর না এনে বৈচিত্রের স্বাদ নিয়ে এলেন। এখানে লোকগীতি এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতের তথা বাউল অঙ্গের গানের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

'বাউল' হিসেবে চিহ্নিত আরেকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের উল্লেখ করছি যার স্বরলিপিও অংশ বিশেষ উপরে দিয়েছি; সেটি হলো 'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে' গানটি। এই গানটিও সহজ ছন্দে দাদরা তালে নিবদ্ধ। মূলত শুদ্ধস্বরের সঙ্গে কোমল নিখাদ মাঝে মাঝে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সহজ সরল ছন্দ ও সুরে গানটি রচনা করেছেন। এখানে লোকসুরের সহজ সরল আবেদনের সঙ্গে রবীন্দ্র বাউলের রচিত গানের সহমর্মিতা লক্ষ করা যায়।

এখানে তালিকা থেকে আরেকটি গানের স্বরলিপি উদ্ধৃত করছি যেটি 'বাউলের গান' বলে নির্দেশিত আছে। গানটি হলো 'ও তো আর ফিরবে না রে' 'মুক্তধারা' নাটকের গান স্বরবিতান-৫২। এই গানটির 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের গানের রূপান্তর 'আমি ফিরব নারে'।

স্বরলিপি এইরকম ঃ

পা | পা পা -ধা II র্সা -া ণা | ধা পা -া I পা -ধা পা | মা গা -মা I
ও তো আ র্ ফি র্ বে না রে ০ ফি র্ বে না আ র্

I রগা -রা গা | মা পা -া I -া -া -া | -া -া -া I
ফি০ র্ বে না রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধা ধা -া | ধা ধা -া I ধা -া ণা | ধা ণা -া I
ঝ ড়ে র্ মু খে ০ ভা স্ ল ত রী ০

I -া -া -া | ধা পা -া I গা -া মা | পা -া -া I
০ ০ ০ কু লে ০ ভি ড়্ বে না ০ ০

I গা -া মা | পা -া -া I গা -া মা | পা পা -র্সা II
ভি ড়্ বে না ০ ০ ভি ড়্ বে না রে ০

এই গানটিও ত্রিমাত্রিক ছন্দে রচিত। শুদ্ধ স্বরের সঙ্গে কোমল নিখাদ ব্যবহৃত হয়েছে। যে কয়টি গানের স্বরলিপি উদ্ধৃত করা হলো তাতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিটি গানই সহজ-সরল ছন্দ ও সুরে গানগুলি রচিত। আরো যেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, বাউল/বাউলের সুর/বা বাউলের গান বলে *স্বরবিতানে* নির্দেশিত গানগুলি প্রধানত সহজ সরল ছন্দ ও সুরে রচিত এবং সেখানে রাগসঙ্গীতের কোনো প্রভাব নেই বললে চলে। বাউল/বাউলের সুর এবং বাউলের গানের মধ্যে মূলত কোনো পার্থক্য নেই।

এখানে আরেকটি গানের উল্লেখ করছি যেখানে ভাটিয়ালী সুরের সঙ্গে মিশে আছে বাউলের উদাস করা ভাবটি। গানটি হলোঃ 'গ্রাম ছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ'। স্বরলিপি এই রকম :

II {ধা -সা -া সা | সা -া সা -রা I গা -পা পা -ধা | পা -া মা -পমা I
গ্রা ০ ম্ ছা ড়া ০ ও ই রা ০ ঙা ০ মা ০ টি ০র্

I মগা -া -া -া | -া -া -া -া I গা -া -া -মা | পা -া -া -ধপা I
প ০ ০ ০ ০ ০ ০ থ্ আ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০০

I -মা -া -া -পমা | -গা -া -সা -রা I গা -া -া মা | মগা -া রা -গরা I
০ ০ ০ ০০ ০ ০ ০ র্ ম ০ ০ ন ভু ০ লা ০য়্

I সা -া -া -া | -া -া (-া -া)} I পা ধা I পা -ধা -র্সা র্সা | র্সা -া র্সা -া I
রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ও রে কা ০ র্ পা নে ০ ম ন্

I র্সা -া -া র্সনা | নধাঃ -পঃ -ধা -না I ধা -পা -া -া | -া -া -া -া I
হা ০ ত্ বা ড়ি ০ ০ ০ য়ে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I ধা ধা ধা -র্সা | সধা -া পা -ধা I মা -পা -া মা | গা -া সা -রা I
লু টি য়ে ০ যা য়্ ধু ০ লা ০ য় রে আ ০ মা র্

I গা -া -া মা | মগা -া রা গা I রসা -া -া -া | -া -া -া -া II
ম ০ ০ ন ভু ০ লা য়্ রে০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

লোকসঙ্গীতের সাধারণ যে বৈশিষ্ট্য সহজ সরল ছন্দ ও সুরের আবেদন, কবিরচিত বাউল/বাউলের সুর বা বাউল গানও একই আবেদনে মর্ম স্পর্শ করে। রবীন্দ্রনাথ এই লোকসুরের বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগান তাঁর বৈচিত্র্যময় ডালি সাজাতে। কেবল যে সুরের দিক থেকে বৈচিত্র্যের ডালি সাজানো এমন নয়, সেই সঙ্গে লোকসঙ্গীতের ভাবগত তথা বিষয়গত দিক দিয়েও কবি মুক্তি খুঁজেন। লোকসঙ্গীতে বিশেষত বাউল গানে অধ্যাত্ম-চিন্তা চেতনারই প্রকাশ লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'পূজা' পর্যায়ের গানে বাউল সুর তথা লোকসুরে গান রচনা করেছেন। তেমনি স্বদেশ পর্যায়ে সন্নিবেশিত গানে লোকসুর ব্যবহার করেছেন। আবার ঋতুসঙ্গীত প্রকৃতি-বিষয়ক গানেও কবি লোকসুরের সহজ সরল আবেদনের মিলন ঘটান। যেমন- 'এই তো ভালো লেগেছিল' কিংবা 'বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা', 'বাদল বাউল বাজায় রে একতারা' প্রভৃতি। বিষয়বৈচিত্র্যের সঙ্গে সুর বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে নবপথের সন্ধান দেখালেন। প্রাচীনসুরের সঙ্গে রাগরাগিণীর মিশ্রণ ঘটিয়েছেন অথচ বাউল গানের তত্ত্বদর্শন মিলিয়ে এক অনন্যতার স্বাক্ষর রাখলেন। বাউল গানের তত্ত্বাদর্শে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবে, ভাষায় ও সুরের সম্মিলনে শ্রেষ্ঠ বাউলগানের সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে স্থান করে নেয়। 'আমি তারেই খুঁজে বেড়াই' ও 'আমি কান পেতে রই' প্রভৃতি গানগুলি এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাউল গানের ঢং অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমা থেকে আরো গভীর ব্যঞ্জনায় বিচিত্র হয়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে।

বাউল গানে আছে ধ্রুপদের মতো চারটি অংশ—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। কিন্তু স্থায়ীর পর অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ প্রায় একই সুরে গীত হয়। কিন্তু রবীন্দ্রসৃষ্ট বাউলগানে সঞ্চারীর সুর নতুন সৃষ্টি। বাউল গানের গঠন প্রণালীর সঙ্গে মিল রেখে কবি গানগুলি রচনা করলেও এখানে তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। এ ক্ষেত্রে কবিকে প্রাচীন রাগরাগিণী বা কীর্তনের সুরের সহায়তা নিতে হয়েছে। তাঁর গানে রাগ-রাগিণী মিশেছে; সেই সঙ্গে বাউল গানের সঙ্গে সামঞ্জস্যও রয়েছে। এই অপূর্ব সমন্বয়ে রচিত কয়েকটি গান—যেমন, বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা, গানটির সঞ্চারীতে 'দেশ' রাগের রূপ পাওয়া যায়। 'আমি তারেই জানি তারেই জানি' গানটির সঞ্চারীতে 'পিলু' রাগ মিশেছে। লোকসুরে রচিত 'রাঙিয়ে দিয়ে যাও' গানটির সঙ্গেও পিলু রাগ মিশেছে, অথচ ধ্রুপদের মতো চারটি অংশে এর সুর রচিত নয়। প্রচলিত বাউল গানের মতোই স্থায়ী ও অন্তরা একই সুরে রচিত।

প্রচলিত বাউল গানে প্রধান লক্ষ্য কথায় ছন্দোবদ্ধ সহজ গতি। অন্যান্য লোকসঙ্গীতের তুলনায় বাউল গান ছন্দোবহুল। এর কারণ বাউলদের নৃত্যের আবেগ। বাউল গান নৃত্য সম্বলিত। ভাবের আবেশে যখন বাউল নৃত্য করে তখন স্বাভাবিকভাবেই ছন্দের প্রয়োজন হয়। আপনা হতে মানুষ সহজে যে ছন্দ পেয়েছে

সেই সহজ ছন্দটি বাউলদের লক্ষ্য। সহজ ভাষা ও সুরের সঙ্গে ছন্দও সহজ হওয়া স্বাভাবিক। সেজন্য বাউল গানে সাধারণত ত্রিমাত্রিক ছন্দ দাদরা বা চতুর্মাত্রিক কাহারবা বা ত্রিমাত্রিক খেমটা জাতীয় ছন্দের পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বাউল অঙ্গের গানেও (বিশেষত যে তালিকা দিয়েছি) এই সহজ ছন্দের ব্যবহার দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের এই সহজাত ছন্দকে গ্রহণ করেছেন তাঁর গানে।

আগেই বলেছি, বাউল গানের সুনির্দিষ্ট কোনো সুর নেই। সারি, ভাটিয়ালী প্রভৃতি সুরের প্রভাবে বাউল গান রচিত। বাংলা লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালী সুরের একচ্ছত্র আধিপত্য। যদিও পদ্মাপারের বাউল গানে ভাটিয়ালীর প্রভাব সমধিক, পশ্চিম বাংলায় লোকায়ত কীর্তনের সঙ্গে ভৈরবী রাগের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। জমিদারী কর্মভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায় দশ বছর কাটিয়েছেন কুষ্টিয়া শিলাইদহ অঞ্চলে। এই কালপর্বে তিনি লোকসঙ্গীতের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তী জীবনে বীরভূমের গৈরিক প্রান্তরে শান্তিনিকেতনে বসবাস করেছেন। ফলে, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাউল গানের সুররূপ তাঁর গানে মিলে মিশে গেছে। তবে, বাংলা লোকসঙ্গীতের বিচিত্রধারা সারি-ভাটিয়ালী সুরের সঙ্গে কবি পরিচিত হন নদীমাতৃক বাংলাদেশে বসবাসকালেই। চুঁচুড়াতেও গঙ্গাবক্ষে মহর্ষির সঙ্গে কাটানোর সময় মাঝি-মাল্লাদের কাছ থেকে সরলা দেবী কর্তৃক সংগৃহীত গানে কবি সুরারোপ করেছেন। গ্রাম বাংলায় পদ্মাবক্ষে বোটে করে ভ্রমণকালে শুনেছেন মাঝির উদাস করা উদাত্ত কণ্ঠে সারি-ভাটিয়ালী গান। *ভারতী*তে প্রকাশিত 'গ্রাম্যসাহিত্য' (১৩০৫) প্রবন্ধটিও শিলাইদহ অঞ্চলের প্রত্যক্ষ প্রভাবজাত। পদ্মাবক্ষে নৌকায় ভ্রমণ করতে গিয়ে কবি শুনলেন মাঝিদের তারুণ্য-উচ্ছল সারি গান :

যুবতী, ক্যান বা কর মন ভারী
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা দামের মোটরি।

কবির মনে হলে, শ্রাবণে ভরাবর্ষার জলপ্লাবনের মধ্যে 'সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল, [সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৯০ : ২১০]। গ্রামবাংলার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে কবি প্রথম সারি-ভাটিয়ালী গানের সঙ্গে পরিচিত হলেন। বাউল গানের সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে মাত্র ২২ বছর বয়সেই এবং উত্তোরত্তর বাংলার এই অবহেলিত গানের প্রতি কবির অনুরাগ তাঁর গানেও প্রকাশ পেয়েছে। বাউল গানের ভাবদর্শনে কবি অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং নিজেও 'রবীন্দ্রবাউল' হিসেবে পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। কবি যদিও বাউলের সুর বলে গান রচনা করেছেন— তা মূলত লোকসুর।[৩]

রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই সারি-ভাটিয়ালী সুর শিলাইদহ, শাহজাদপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, পাবনা অঞ্চলে বোটে করে পদ্মায়, নাগর, বড়ল, বলেশ্বরী, ইছামতী, আত্রাই, চলনবিলের উপর দিয়ে ভ্রমণকালে মাঝিমাল্লার কণ্ঠে অকৃত্রিম হৃদয়ের সরল গান শুনেছেন; এবং সেই সুরে ও ছন্দে গান রচনা করেছেন। সারিগানে মূল বিষয়বস্তু নদী ও নৌকা; রাধাকৃষ্ণ বিষয় কিংবা সমকালীন ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত। হাল্কা কৌতুক রসাত্মক বিষয় নিয়েও সারিগান রচিত হয়। যেমন—সুনামগঞ্জ অঞ্চলে একটি সারিগান প্রচলিত আছে। দাদু-নাতিন সম্পর্কিত বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত ত্রিমাত্রিক ছন্দে দ্রুতলয়ে গাওয়া হয়। গানটির অংশবিশেষ এখানে তুলে দিচ্ছি :

নাতিন আমার চন্দ্রবদন রসের কমলা
ফুল তুলিতে যায় গো নাতীন দুইপর বেলা।
নাতীন লইয়া দাদায় খেলইন বইস্যা কদমতলা
(কিরে সাবাস্ সাবাস্ হেইয়া)
(আরে) বিরলে পাইয়া দাদায় গলায় দিলা মালা।।

কিন্তু রবীন্দ্র চেতনায় সারিগানের ভাব অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ সীমারেখা থেকে সুদূরের আহ্বান নিয়ে আসে- অসীমলোকে পাড়ি জমানোর ব্যঞ্জনা ধ্বনিত হয়ে উঠে :

তারি সুদূর সারিগানে বিদায়স্মৃতি জাগায় প্রাণে।

কিংবা :

ঐ দেখো কতবার, হল খেয়া পারাপার
সারিগান উঠিল অম্বরে।।

মাঝি-মাল্লার গান শুধু নদী ও নৌকার গান হয়ে উঠে না, কোন্ সুদূরলোকে খেয়া পারাপারের অসীম পথে পাড়ি জমানোর খেয়াতরীর মাঝির গভীর আকুতি ঝরে পড়ে গানের কথায় ও সুরে। সারিগান অবলম্বনে গানও রচনা করেছেন। যেমন :

১। আমি মারের সাগর পাড়ি দেব,
২। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে (মূলগান : হরিনাম দিয়ে জগত মাতালে),
৩। এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে (মূলগান : মন মাঝি সামাল্ সামাল্),
৪। খরবায়ু বয় বেগে চারিদিক ছায় মেঘে।

এই গানগুলি দ্রুতলয়ে অর্থাৎ সারিগানে যেমন দ্রুতগতির জন্যে দ্রুতছন্দের প্রয়োজন হয়, কবিও তাঁর গানে দ্রুতলয় ব্যবহার করেছেন এবং সেখানে সহজছন্দ চতুর্মাত্রিক ও ত্রিমাত্রিক ছন্দ (কাহারবা ও দাদরা) ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু গানের সুরে ভাটিয়ালীর স্বরবিন্যাস প্রযুক্ত হয়েছে।[8]

ভাটিয়ালী বিলম্বিত লয়ে টেনে টেনে গাওয়া হয়। ছন্দের গুরুত্ব নেই। তালেও সীমাবদ্ধতা নেই। অনেক সময় তালবিহীন বা বৈতালিকে গীত হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী গানের সুরে এমন এক করুণ ও উদাত্ত সুরের মর্মস্পর্শী আবেদন থাকে যে, বাংলাসঙ্গীতে বিশেষত লোকসঙ্গীতে এই সুরের প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভাটিয়ালী সুরের একটি সার্বজনীন রূপ পরিলক্ষিত হয় রাগসঙ্গীতের কশৌলী ঝিঁঝিটের সঙ্গে যার সাযুজ্য আছে।

রাগ সঙ্গীতের ঝিঁঝিটের সঙ্গে লোকসঙ্গীতে প্রচলিত ঝিঁঝিট, যাকে সঙ্গীতবিদ সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী কশৌলী ঝিঁঝিট বলে আখ্যায়িত করেছেন তার স্বররূপ ভিন্ন। রাগসঙ্গীতের ঝিঁঝিটের স্বররূপ এই রকম :

সা রা মা । পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া প্া ।
প্া ধ্া সা রা গা মা গা মা গা । ধ্া সা

লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত কশৌলি ঝিঁঝিটের স্বররূপ হলো :

সা রা মা । পা মা গা রা সা ণ্া ধ্া । ধ্া সা সা রা গা, রা গা সা ।

এই কশৌলী ঝিঁঝিটের স্বররূপ ভাটিয়ালী গানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গানেও এই স্বররূপের পরিচয় পাই। সারি-ভাটিয়ালীর আদর্শে রচিত কয়েকটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের উদাহরণ দেয়া যায় এই প্রসঙ্গে :

(১) আমার সোনার বাংলা,
(২) গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ,
(৩) মাটি তোদের ডাক দিয়েছে,
(৪) পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে,
(৫) বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা।

'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে' এই গানটিও সারি-ভাটিয়ালী অর্থাৎ লোকসুরে রচিত। সারি-ভাটিয়ালী ছাড়াও বাংলায় প্রচলিত কথকথার রীতিতে কবি

রচনা করেছেন 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' গানটি। গানটি সম্পর্কে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন :

> গানটিতে সুর বলতে প্রায় কিছুই নেই, কেবল এখানে ওখানে একটু আধটু কেদারা, মল্লারের রেশ মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। কীর্তন ও বাউল সুরের ছোঁয়াও আছে। 'কালো' কথাটিকে ব্যবহার করলেন ঠিক সেইভাবেই যেভাবে আমরা কথাবার্তা বলি [সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৬৮ : ২১]।

বাংলা গানে এক নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত নিয়ে এলেও এ জাতীয় গান কবি খুব বেশি রচনা করেননি। 'ছবি' কবিতাও কথকথার ঢঙে সুরারোপিত বলে সন্‌জীদা খাতুন জানিয়েছেন। শান্তিদেব ঘোষ ঐ ঢঙে পরে রেকর্ডে গানটি গেয়েছেন।

শান্তিদেব ঘোষ তাঁর *রবীন্দ্রসঙ্গীত* গ্রন্থে রবীন্দ্রসঙ্গীতে লোকসঙ্গীতের (দেশী সঙ্গীত) প্রভাব সম্বন্ধে মূল্যবান আলোচনা করেছেন এবং বাংলায় প্রচলিত প্রাচীন সুরের বিভিন্ন দিক নিয়ে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, বাংলার নিজস্ব দেশী সুরের প্রেরণায় রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংখ্যা হবে প্রায় দুইশত'র মতো।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম অর্ধে রচিত লোকসুরে অর্থাৎ বিভাস রাগে কয়েকটি গান পাওয়া যায়। তবে বাংলায় বিভাস রাগের সঙ্গে রাগসঙ্গীতের বিভাসের কোনো মিল নেই। বাংলায় প্রচলিত বিভাস যে সত্যই এ অঞ্চলেরই একটি সুর তা বুঝা যায় পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার নানা প্রকার গান শুনে। বিভাস পল্লী অঞ্চলে এমনভাবে নিজের রূপ প্রকাশ করেছে যে, তাকে পল্লীগানের সুর বলে ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের মতে, বাংলার বিভাস ও দেশকার রাগিণী এক। বাংলায় বিভাস রাগিণীর জাতি ঔড়ব-খাড়ব; আরোহণে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত, অবরোহণে মধ্যমবর্জিত। রাগের মূল গতি :

সা রা গা পা ধা র্সা না ধা পা গা রা সা ।

প্রচলিত স্বরবিন্যাস এই রূপ :

সা রা গা পা ধা, পা ধা না র্সা,
পা ধা পা না ধা, পা গা রা, সা রা গা গা রা সা, সা রা,
রা গা, গা পা, পা ধা, ধা র্সা, না ধা, পা ধা র্সা, না ধা,
পা র্সা না ধা, পা গা রা, সা রা গা রা সা ।

ভাতখণ্ডে বলেছেন, এই রাগিনীতে রে ও ধা হবে কোমল। বাংলায় সবই শুদ্ধ স্বর ব্যবহৃত হয়।

রবীন্দ্রনাথের কতকগুলি গানকে বিভাস রাগে রচিত বলে চিহ্নিত করা হলেও এই সুরের মধ্যে গ্রামবাংলার লোকসুরের যে ছাপ আছে, একে রাগসঙ্গীত বলে আলাদা বিভাজন করা যায় না। যেমন, মিশ্রবিভাসে রচিত 'হৃদয়ের এ কূল ও কূল' এবং 'ওলো সই, ওলো সই' গান দুটি। এদিকে ওস্তাদি আবহাওয়ায় চৌতালে রচিত বিভাস রাগিণীর 'ওঠো, ওঠো রে বিফলে প্রভাত' গানটিকে পল্লী অঞ্চলের বলে মনে হবে না। পরবর্তী জীবনে কবি আরো অনেক গান রচনা করেছেন বিভাস রাগে। সেগুলি রাগসঙ্গীতের ধারায় রচিত না হওয়ায় বাউল বা লোকসুরের গান বলে মনে হতে পারে। এরকম কয়েকটি গান :

(১) ডাক্‌ব না ডাক্‌ব না,
(২) এ বেলা ডাক পড়েছে,
(৩) নিশিদিন ভর্‌সা রাখিস্‌,
(৪) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে প্রভৃতি।

শান্তিদেব ঘোষের ভাষায় :

> এগুলিতে অনেকসময় ভুল করে বাউলদের গানে পাওয়া এক ধরনের সুর বলে মনে করি, কিন্তু এ হল বাংলা দেশী বিভাস, যা উচ্চ-নীচ সব শ্রেণীর গাইয়েদের মধ্যে সহজে স্থান পেয়েছিল [শান্তিদেব ঘোষ ১৩৯৪ : ৯১]।

বাংলার নিজস্ব সুর ও ঢঙে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে আরো একটি নতুন সৃষ্টির প্রকাশ পাওয়া যায় যাকে রাবীন্দ্রিক কীর্তন বা রাবীন্দ্রিক বাউল বলে আখ্যায়িত করা যায়। আখর বর্জিত, বাউলের প্রভাবমুক্ত এবং রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন জীবনে যার সুত্রপাত সেই গান। আসলে, এ হলো কীর্তন ও পূর্ববঙ্গের বাউলদের সুরের মিশ্রণে উদ্ভূত এক বিশেষ সুরের গান। জীবনের শেষ অর্ধেই এই গান কবি সবচেয়ে বেশি রচনা করেছেন। এই গান বাউল ও সারি গানের মতো চার বা তিন মাত্রা ছন্দের তালে বাঁধা নয়, এতে তেওরা, ঝাঁপতালও স্থান পেয়েছে। কিন্তু ত্রিতাল, চৌতাল, ধামার, আড়াচৌতাল, সুরফাঁকতাল ইত্যাদি উচ্চাসঙ্গীতের তালগুলি একেবারেই এ গানে স্থান পায়নি। এ ধরনের কয়েকটি গান হলো [শান্তিদেব ঘোষ ১৩৯৪ : ৯০] :

(১) ওরা অকারণে চঞ্চল (চার মাত্রার ছন্দ, কাহারবা, স্বর-৫),
(২) আমার কী বেদনা সে কি জানো (ত্রিমাত্রিক ছন্দ, দাদ্‌রা, স্বর-৫৪),
(৩) যেতে যেতে চায় না যেতে (২/৩/২/৩ ছন্দ, ঝাঁপতাল, স্বর-৪৪),
(৪) লহো লহো তুলে লহো (৩/২/২ ছন্দ তেওরা, স্বর-৩১),
(৫) আমি যখন ছিলেম অন্ধ (৩/২/২ ছন্দ, তেওরা, স্বর-৪২)।

এই গানগুলিকে স্পষ্ট 'রবীন্দ্র বাউলের' রচনা বলা যায়।

বাউল, ভাটিয়ালী, সারিগান ব্যতীত লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারায়ও কবি গীতরচনা করেছেন। লোকসঙ্গীতের অন্যতম উপজীব্য বিষয় প্রেম। বাংলার লৌকিক প্রেমসঙ্গীতের বিশেষত্ব হলো এই যে, তা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলাকে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে। বাংলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে :

কানু ছাড়া গীত নাই
রাধা ছাড়া সাধা নাই।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'প্রেম' বিষয়ক গানও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুরণন *ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলীতে* রয়েছে। কিন্তু লৌকিক প্রেমগীতিতে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলাকে স্বর্গীয় বলে অনুভব করা যায় না, বরং সম্পূর্ণ পার্থিব বলেই ধরা হয়। রবীন্দ্রনাথও রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কের মধ্যে পার্থিব জীবন রসেরই সন্ধান পেয়েছেন। এই বিষয়ে পশ্চিম বাংলার লোকসঙ্গীত ঝুমুর গানের সঙ্গে তাঁর রচিত গানগুলির রচনা ও ভাবগত সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় বলে আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মনে করেন। কারণ, 'ঝুমুর গানও রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গভিত্তিক লৌকিক প্রেম সঙ্গীত [আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৩৮০ : ২৩১]। তবে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রোম্যান্টিক চেতনাকে এসব গানেও প্রকাশ করেছেন পরিমিত রূপে। যেমন :

(১) মরি লো মরি আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।।
ভেবেছিলেম ঘরে রব, কোথাও যাব না-
ওই যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বলো কী করি। (রচনাকাল ১২৯১)
(২) দুজনে দেখা হল-মধু যামিনীরে,
কেন কথা কহিল না, চলিয়া গেল ধীরে (রচনাকাল ১২৯১)
(৩) ওগো শোনো কে বাজায়!
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশির তানে মিশে যায়। (রচনাকাল ১২৯৩)
(৪) এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশি শুনেছি,
মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি। (রচনাকাল ১৩০০)

এই গানগুলিতে লোকায়ত ঝুমুরের সঙ্গে পাই লোকায়ত কীর্তনের প্রভাব; যাকে বলে ঢপ্‌কীর্তন। শাস্ত্রীয় কীর্তনের জটিল ও বহুচারী তাল থেকে মুক্ত এবং রাগ-রাগিণীর বিচিত্র সূক্ষ্মতার বাইরে একসময় এক সরল কীর্তনের ধারা বাংলায় প্রবাহিত ছিল। মুর্শিদাবাদের রূপচাঁদ অধিকারী (১২২৯-৯৯) এবং বনগ্রামের

মধুসূদন কিন্নর বা মধুকানের (১২২৫-৭৫) উদ্‌যোগে ঢপ্ কীর্তনের সৃষ্টি হয়। মনোহরশাহী কীর্তনের সুর ভেঙে সহজগ্রাহ্য সুরে তালে ঢপ্ কীর্তন একসময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। আখরহীন এই কীর্তনে পাঁচালী ও যাত্রাগানের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। ঢপ্ কীর্তনে সাধারণত তিন, চার, পাঁচ ও সাত মাত্রার তাল ব্যবহৃত হতো; শাস্ত্রীয় কীর্তনের মতো দশকোষী, আড়, লোফা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি জটিল তাল ব্যবহার হত না। রবীন্দ্রনাথের কীর্তনাঙ্গ গানে ছয়, সাত, আট বা দশমাত্রার সহজ তাল ব্যবহৃত হয়েছে। কীর্তন গানের তাল ফেরতার রীতি তিনি বর্জন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কীর্তন প্রভাবিত গানের বেশ গরিষ্ঠ সংখ্যায় ঢপ্‌কীর্তনের ভাব ও রীতি দেখা যায়। 'ওকে বলো সখি বলো, কেন মিছে করে ছল' *মায়ার খেলার* এই গানে মধুকানের স্পষ্ট প্রভাব আছে [সুধীর চক্রবর্তী ১৩৯৫ : ১১৮-১৯] কবি লোকায়ত কীর্তন বা ঢপ্‌কীর্তনের সুরকেই গ্রহণ করেছেন তাঁর গানে।

বাংলায় প্রচলিত গোষ্ঠগানের দুটি ধারা-একটি বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তর্গত, অপরটি লৌকিক। রবীন্দ্রনাথ গোষ্ঠগানের লৌকিক রীতিতে গীত রচনা করেছেন। গানটি হলো :

হেদে গো নন্দরাণী
আমাদের শ্যামকে ছেড়ে দাও।
আমরা রাখাল বালক দাঁড়িয়ে দ্বারে
আমাদের শ্যামকে দিয়ে যাও।।

এই গানটি কবি সম্পূর্ণ আত্মনির্লুপ্ত হয়ে রচনা করেছেন বলে তার লৌকিক ধারাটি পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে, তার মধ্যে তার নিজস্ব মনোভাবের কোনো ছায়া পড়েনি।

লোকসঙ্গীতের একটি প্রধান অংশ হলো কর্মসঙ্গীত বা শ্রমসঙ্গীত। এই কর্মসঙ্গীত সাধারণতঃ সমবেত কণ্ঠে গীত হয়, যেমন– সারিগান। একসঙ্গে দাঁড় টানবার বা বৈঠা বাইবার সময় মাঝি যে গান গায়, তাকে নৌকাবাইচের গান বলে, তা কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত। তেমনি চাষের গান, ধান কাটার গান, তাঁত বোনার গান, ছাদ পেটানোর গান, ধান ভানার গান—এ সবই কর্মসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত। এই কর্মসঙ্গীতের ছন্দ ও সুরে কবি গান রচনা করেছেন– আগেই তার বিবরণ দিয়েছি। এখানে একটি চাষের গান উল্লেখ করছি :

আমরা চাষ করি আনন্দে।
মাঠে মাঠে বেলা কাটে সকাল হতে সন্ধ্যে।

রৌদ্র ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, বাঁশের বনে পাতা নড়ে,
বাতাস ওঠে ভরে ভরে চষা মাটির গন্ধে।।

কিংবা, ফসলকাটার আহ্বান গানে কবি মাটির সুরে আমন্ত্রণ জানান :

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয়রে চলে
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে,
দিক্ বধূরা ফসল খেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে
মরি হায় হায়।
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।
ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো, খোলো দুয়ার খোলো।
খোলো, খোলো দুয়ার খোলো।

গানের সুরে কবি মুক্তি খুঁজেছেন। 'গানের সুরে আমার মুক্তি উর্ধে ভাসে।' এই মুক্তি আকাশ, মাটি, নদী, রাখালিয়া বাঁশির সুরে ও বাউলের উদাস করা গৈরিক পথে সুরের সন্ধানে অবাধ বিচরণ করেছেন। রাগসঙ্গীত, পাশ্চাত্যসঙ্গীত, লোকসঙ্গীতের সমন্বয় সাধনের এক অগ্রণী পথিকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথকে পাই। বাংলা সঙ্গীতের দৈন্য ঘুচাতে নব সৃষ্টির ইঙ্গিত রেখে যান সুরস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। স্বতঃউৎসারিত লোকসঙ্গীতের বিচিত্র ধারার মিলন ঘটেছে বলেই রবীন্দ্রসঙ্গীত আজ এত জনপ্রিয় ও সমাদৃত বাঙালির হৃদয়ে। সঙ্গীতলোকেও তা এক বিশিষ্টতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

টীকা

১. উল্লেখিত তালিকায় ৪৪ বছরের রচিত গানগুলি প্রকৃতপক্ষে কবির ৪৪ বছরের কাছাকাছি সময়ে রচিত।

২. স্বরলিপি নেই।

৩. একথা আগে উল্লেখ করেছি যে, প্রধানত বাউল গানে সারি-ভাটিয়ালী সুর ব্যবহৃত হয়—বিশেষত বাংলাদেশের বাউল গানে। লোকসঙ্গীতে ভাটিয়ালী সুরেরই প্রবল

প্রভাব দেখা যায়। সুরের দিক দিয়ে বাউল, ভাটিয়ালী ও সারি গানে প্রায় একই স্বরবিন্যাস ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। ছন্দের গতিতে বাউল, সারি, ভাটিয়ালী গানে এই পার্থক্য বিদ্যমান। ভাটিয়ালী টেনে টেনে ধীর লয়ে গীত হয়। তার ছন্দও অত্যন্ত ঢিমা লয়ে, অনেকসময় তালবিহীনও গাওয়া হয়। আর, সারি গান দ্রুত লয়ে গাওয়া হয়। সারিগান প্রতিযোগিতামূলক। নৌকা বাইচের সময় গাওয়া হয়, সে জন্য তা গতির গান। দ্রুত লয়ের ছন্দে সারিগান সমবেতভাবে গাওয়া হয়। সাধারণত দ্রুতছন্দে সারিগান পরিবেশিত হয়। সারিগানের প্রভাবে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতে দ্রুতছন্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সারিগানে চর্তুমাত্রিক ছন্দই প্রধান; কিন্তু বাউলগানে ত্রিমাত্রিক ছন্দের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। বাউল গান নৃত্যসম্বলিত; সে কারণে ছন্দ প্রধান হলেও সাধারণত মধ্যলয়ে গাওয়া হয়। স্বদেশী যুগে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রায় সবকটিতেই আছে ত্রিমাত্রিক ছন্দ। সে কারণেই সম্ভবত কবি লোকসুরে তাঁর রচিত গানগুলিকে বাউলের সুর বা বাউল সুর বলে চিহ্নিত করেছেন। ছন্দের দিক দিয়ে বাউল আর সুরের ক্ষেত্রে সারি-ভাটিয়ালীর সংযোজনে রচিত রবীন্দ্রসঙ্গীতগুলিকে তাই রবীন্দ্র বাউলের গান বলে চিহ্নিত করাই সমীচীন।

সারি-ভাটিয়ালী গান নদীমাতৃক বাংলাদেশের একান্তই নিজস্ব সম্পদ। সারি, ভাটিয়ালী- উভয়ই নদী ও নৌকার গান। সারি মানে শ্রেণি বা পংক্তি। নৌকার দুপাশে সারিবদ্ধভাবে বসে সমানভাবে অঙ্গচালনার মধ্যে একটা নিয়মবাঁধা ভাব আছে। এক সঙ্গে বৈঠা ফেলে তাল রক্ষা করা হয়। বাংলাদেশে, বিশেষ করে সিলেট-সুনামগঞ্জ অঞ্চলে নৌকা বাইচের গানকেই সারিগান বলা হয়। সারিগান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হয় দ্রুতলয়ে; যেহেতু তা প্রতিযোগিতামূলক। অনেকে সারিগানকে কর্মসঙ্গীতের পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কেননা বৈঠা চালনা করতে শ্রম স্বীকার করতে হয়।

৪. এখানে ভাটিয়ালী গান বিষয়ে আসা যাক্। ভাটিয়ালী গান মাঝি-মাল্লার গান—নদী, নৌকা ও প্রান্তরের গান। ভাটির সাথে আলী প্রত্যয়যোগ করে শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। নদীস্রোতের সপক্ষে বা নিম্নদিককে ভাটি বলা হয়। সেই ভাটিপানে নৌকা ছেড়ে দিলে আপনা আপনি তো ভেসে চলে, সেজন্যে কোন শারীরিক শ্রম বা আয়াস স্বীকার করতে হয় না। এই অনায়াসই অলস মুহূর্ত সৃষ্টি করে। মাঝি তার মনের সুখ-দুঃখ, বিরহ-ব্যথা, জগত-জীবন সম্পর্কে উৎসুক্য প্রকাশ করে গানে। মানবিক প্রেম, বিরহ-ব্যথা, বাস্তব জীবনের কথা, নদী ও নৌকা, প্রকৃতি ও প্রেম হলো ভাটিয়ালীর বিষয়বস্তু। রাধাকৃষ্ণ প্রেম প্রসঙ্গও আছে। পরে এলো দার্শনিকতা। নদী হলো জীবননদী, নৌকা হলো দেহতরী। এই রূপকাশ্রয়ে ভাটিয়ালী গান রচিত হয়েছে। ভাটি পানে নৌকা ছেড়ে দিয়ে আয়েসে গান গেয়ে ওঠে :

মন মাঝি, তোর বৈঠা নেরে
আমি তো আর বাইতে পারলাম না।

মাঝি-মাল্লা ও কৃষক-রাখালের লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ প্রেম-ব্যথাই ভাটিয়ালী গানের মূল বিষয়বস্তু। সিলেট সুনামগঞ্জ অঞ্চলে ভাটিয়ালীকে বন্ধু-বিচ্ছেদের গানও বলে। যেমন সুনামগঞ্জের ভাটি অঞ্চলে ভাটিয়ালী সুরে বন্ধু-বিচ্ছেদের একটি গান প্রচলিত আছে, গানটি হলো :

সুজন বন্ধুরে ও বন্ধু
কোন্ বা দেশে থাকো অভাগীরে কান্দাইয়ারে।
কন্যার এ মন রাখো সুজন বন্ধুয়ারে।
পিরীত কইর‍্যা ছাইড়া গেলায় রে
ও বন্ধু লাগাইয়া মমতা
অন্তরে মোর জ্বালাইলায় বিনা কাষ্ঠে চিতা রে।
উজান বাঁকে থাকো বন্ধু রে
ও বন্ধু ভাইটল বাঁকে থানা
চোখের দেখা মুখের হাসি
কে॰কইরাছে মানা।
জ্যৈষ্ঠ না আষাঢ় মাসে গো
ও বন্ধু গাঙ্গে নয়া পানি
আমার কি মনে ছিলো না
খেলতাম নাও দৌড়ানি রে।।

এই গানের মূল বিষয় প্রেম এবং এই গান কেবল বিরহেরই গান। যে কারণে একে বন্ধু-বিচ্ছেদের গানও বলা হয়ে থাকে। ভাটিয়ালী একক কণ্ঠের গান, পুরোপুরি ব্যক্তিচেতনার গান। সারিগান সমবেত কণ্ঠের গান। সমবেত কণ্ঠের গানে জীবনের দ্রুতি ও গতি। একক কণ্ঠের গানের মধ্যে জীবনের স্থিতি। ভাটিয়ালী একক কণ্ঠের গান বলেই এতে জীবনের মর্মকথা শান্ত, গম্ভীর ও দীর্ঘস্থায়ী সুরের রূপ নেয়। এই সুর মুক্তির সুর এবং এই মুক্তি আকাশ, নদী, মাঠ ও প্রান্তরের। ভাটিয়ালী ও সারিগানের মধ্যে সারিগানকে প্রাচীনতর বলে মনে হয়। কেননা, আদিম সমাজে সংঘবদ্ধতা এসেছে আগে; পরে হয়েছে ব্যক্তিচেতনার উদ্ভব। সারিগান গোষ্ঠিচেতনার গান আর ভাটিয়ালী ব্যক্তিচেতনার গান। এদিক দিয়ে সারিগানের তুলনায় ভাটিয়ালী গান অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের।

গ্রন্থপঞ্জি

আশুতোষ ভট্টাচার্য ১৩৮০ — *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসাহিত্য*। কলকাতা : এ. মুখার্জী এণ্ড সন্স।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় — *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী,* ১ম খণ্ড।
১৩৮০ — শান্তিনিকেতন : টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট।
১৩৮৫ — ২য় খণ্ড।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সংগীতচিন্তা। কলকাতা : বিশ্বভারতী।
১৩৯৪

শান্তিদেব ঘোষ — *রবীন্দ্র সঙ্গীত*। কলকাতা : বিশ্বভারতী।
১৩৯৪

সলিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — *রবীন্দ্রনাথ ও লোকসংস্কৃতি*। কলকাতা : নবজাতক প্রকাশন।
১৩৯০

সুধীর চক্রবর্তী — *গানের লীলার সেই কিনারে*। কলকাতা : অরুণা প্রকাশনী।
১৩৯২
১৩৯৫ — 'রবীন্দ্র সংগীতে কীর্তনের প্রভাব', *রবীন্দ্র সংগীতায়ন* (সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চৌধুরী সম্)। কলকাতা : প্যাপিরাস।

সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর — *রবীন্দ্রনাথের গান*। কলকাতা।
১৩৬৮